প্রশ্ন: ~~ইহা প্রধ~~ "ইহা প্রধানতঃ একটি নিখুঁত চিত্র, ইহাতে যে করুনরস আছে তাহা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়া এক অলৌকিক মায়াময় ব্যঞ্জনা জাগাইয়া দেয়," — 'সোনার তরী' কবিতাটি সম্পর্কে সমালোচকের এই উক্তি যথার্থ কিনা বিচার করো। (১২)

→ রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিভা 'সোনার তরী'তে এসে পরিণতি লাভ করে ছিল। 'সোনার তরী' কাব্যের শুরুতে 'সোনার তরী' এবং শেষে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। এই কবিতা দুটি রবীন্দ্র প্রতিভার ভিন্নমুখী দুই ধারার প্রতীক। সোনার তরী শুরুতে অবস্থিত হয়ে কবির মানবাভিমুখী সুরটি ধরলেন এবং খুব সম্ভবত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র চূড়ান্তে অবস্থান নিরুদ্দেশ্য সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার প্রবনতা সূচনা করে। 'সোনার তরী' কবিতাটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, কবিতাটি চিত্র রস প্রধান। পদ্মাতীরের অতি পুরাতন একটি ঘটনাকে অপূর্ব শব্দ সঙ্গীত ও ছন্দ মাহাত্ম্যে আশ্চর্য চিত্র সম্পদ দান করা হয়েছে।

কবিতাটি প্রধানত একটি নিখুঁত চিত্র, এতে যে করুনরস আছে তা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে সেখানে অলৌকিক মায়াময় করুণ ব্যঞ্জনা জাগিয়ে দেয়। সমালোচকের এই মন্তব্য কতখানি প্রাসঙ্গিক তা কবিতাটির সামগ্রিক পাঠে উপলব্ধি করা যায়। 'ছিন্নপত্রে'র কোনো এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — আমাদের চরের মধ্যে জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে — আমার বোটের কাছ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্ছে, আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি — যখন আর কয়েকদিন থাকলে ধান পাকতো তখন ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে কি নিদারুন তা বুঝতে পারা যায়। প্রথম বর্ষার এইরকম একটি করুন দৃশ্য সোনার তরীর কবিতাটির সূচনায় দেখতে পাই। অতএব দেখা যাচ্ছে ধান তখন নিতান্তই সবুজ। কবি তাঁর এক আঁটি সোনার ধান নিয়ে নিজের জীবনের ক্ষুদ্র গন্ডিতে ক্ষুদ্রত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। —

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা —
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

সম্মুখের কালো স্রোতে জগতের বৃহৎ জীবন অতিবাহিত। বারাবর নৌকার আলোড়ন সেই জীবনযাত্রা আভাস বহন করে এনেছে। কবি সেই বৃহৎ জীবনের জন্য উৎসুক, তাই কবি বলছেন —

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

কবি চাইছেন যে, কবির সৃষ্টি সম্ভারকে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কারণ তাঁর সাধনার ফসল একটা সীমিত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। কবি যখন বৃহত্তর জীবনের জন্যে উন্মুখ, তখন কবি কল্পনা করেছেন যে, সেই মাঝি কবির কাছে এসেছেন তাঁর সোনার ফসল নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কবিকে এতকাল সেই সাধনার ফসল নিজের ক্ষেতের মধ্যে গন্ডিবদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু মাঝি এসে কবির সেই সোনার ফসল তুলে নিল এবং কবিও তা তুলে দিতে অকৃপণ, তাই কবি বলছেন—

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে?— আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে—

কবি তাঁর সমস্ত সাধনার ফসল মাঝিকে দিয়ে দেওয়ায় রিক্ত হয়ে পড়েছে। যা দিয়ে প্রেরণা দেওয়া হয় অন্যকে তখন আর তাতে নিজের অধিকার থাকে না, কবিরও তাই হয়েছে। কবিও মাঝিকে সবকিছু দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, তখন তার সঙ্গে নিজেকে নিতে বলেছেন।—

এখন আমারে লহো করুণা করে।

~~কিন্তু কবি ভেবেছেন~~ তারে ফসল নিয়ে সোনার তরী চলে গেল সেখানে ~~সাধকের~~ কোনো স্থান রইল না, কবিতাটির প্রাণ এই সাধকের করুণরসেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, এতে কবির দুঃখ বিস্ময়ের জন্য; তার উত্তরে বলা যায় 'এতদিন নদীকূলে যাহা লয়ে' তাঁর সমস্ত কিছু তিনি ভুলে ছিলেন, সেই সমস্তই সোনার তরীর মাঝি তাঁকে ফেলে রেখে নিয়ে চলে গেল। এই প্রিয় বস্তু বিচ্ছেদের দুঃখ কবির,